ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

সুলতানি আমলে বাংলার শিক্ষা বিস্তার: ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা

ড. আবু নোমান*

সারসংক্ষেপ: শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলে শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির মেরুদণ্ড গঠনে প্রধানতম হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানবসন্তান সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির শিক্ষাব্যবস্থার একটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। যে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা যত বেশি কল্যাণকামী ও পূর্ণাঙ্গ সে জাতি তত বেশি সুষমামণ্ডিত মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠে। বাংলায় মুসলিম শক্তির বিজয়ে ইসলামি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। সুলতানি শাসনামলে বাংলায় শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ যেমন ছিল তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সুলতানদের সহযোগিতায়ও বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এ পর্যন্ত পাওয়া সুলতানি শাসনামলের মাদরাসাগুলোর অধিকাংশই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার অধিকাংশই পরবর্তীতে সুলতান বা শাসকদের সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলার সুলতানি পর্বে শিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।]

বাংলার সুলতানি সমাজে মসজিদ, মাদরাসা এবং খানকাহ এই তিনটি প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সমাজের সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সপ্তাহের একটি দিন শুক্রবারে মুসলমানগণ জুমার মসজিদে একত্রিত হয়ে থাকেন। সেখানে সুলতান বা সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি নামাজের নেতৃত্ব দিতেন। সেখানে তিনি খুতবা (বক্তব্য) প্রদান করতেন। কখনও কখনও মুসলমানদের মাঝে তাঁরা জ্ঞানের বিনিময় করতেন। কোনো কোনো মসজিদের একটি অংশ সুফিদের নির্বিঘ্ন ইবাদত ও নিয়মিত জ্ঞান চর্চার জন্য নির্দিষ্ট থাকতো। সুলতানি শাসনকালে দেখা গেছে, জামে মসজিদগুলোয় সুলতান নিজে বা তাঁর প্রতিনিধিগণ জুমা নামাজে নেতৃত্ব প্রদান করতেন। অন্যান্য মসজিদগুলোয় উলামা শ্রেণী কর্তৃক নামাজ সম্পন্ন হতো।

সাধারণ মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত করা এবং উলামা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মাদরাসা নির্মিত হতো। সমাজের বিত্তবান মুসলমানগণ কখনও কখনও সুলতান মাদরাসা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় খরচ প্রদানের উদ্দেশ্যে ভূমি দান করতেন।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

উলামা শ্রেণী এই মাদরাসাগুলোয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত থাকতেন। মুসলিম সমাজে এই প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। উলামাগণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন।

উপমহাদেশের বিখ্যাত সুফি-সাধক ও বিশিষ্ট আলিম শাইখ নিযাম আল-দীন আওলিয়ার নিকট হতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পর শাইখ আখী সিরাজ আল-দীন উসমান ফখর আল-দীন জাররাদীর নিকট শরীয়তের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[১] শিক্ষক শাইখ ফখর আল-দীন জাররাদীর মৃত্যুর পর তিনি গৌড় এবং পাণ্ডুয়ায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। এখানে তিনি অনেক ছাত্র ও শিষ্য পান। এদের মধ্যে শাইখ আলাউল হক ছিলেন অন্যতম।[২] শাইখ নূর কুতুব-উল আলম ছিলেন গিয়াস আল-দীন আযম শাহের দরবারের একজন বৃত্তিভুক্ত ছাত্র। তিনি কাযি হামিদ আল-দীন নাগাওয়ারী এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পাণ্ডুয়ার একজন বিখ্যাত সুফি ছিলেন। রাজা গনেশের মুসলিম নির্যাতনের প্রতিবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, সুফিরা প্রধানত শরীয়ত ও আধ্যাত্মিকতার জ্ঞানার্জন করেছেন এবং পরবর্তীতে সমাজসেবার মহান দায়িত্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ শ্রেণীর আলিমরাই হচ্ছেন উলামা-ই-আখীরাত।

উলামা শ্রেণী মুসলিম সমাজের কল্যাণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মসজিদের একজন ইমাম হিসেবে, মাদরাসার একজন শিক্ষক হিসেবে, সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের একজন প্রচারক (মুবাল্লিগ) হিসেবে এবং খানকাহ এ একজন সুফি হিসেবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে জ্ঞানের আলোয় করেছেন উদ্ভাসিত। তাঁদের সুন্দর নৈতিকতা, আচরণ ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ উলামার কাছে এসে তাঁদের কথা শুনে ঐহিক জ্ঞান লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁরা ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোয় 'মুযাকারা' করতেন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে মসজিদ, মাদরাসা এবং খানকাহ-এ জ্ঞান লাভ করতেন। বিশ্বের অগণিত ভক্তকুল ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াবলি সম্পর্কে তাঁদের মতামত শুনতে ও জানতে পারতো।

মুসলিম বিজয়ের পরপরই বাংলায় পির দরবেশ আলিম-উলামাদের আগমন আরম্ভ হয়। জনগণের মাঝে ইসলাম প্রচার, ইসলামের শিক্ষা ও মর্ম অনুধাবন, শরীয়তের অনুশাসনসমূহের ব্যাখ্যা এবং তদভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করা, খানকাহ নির্মাণ, দরিদ্র লোকদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, এমনকি প্রয়োজনে ইসলাম ও মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সুফি ও আলিম-উলামার অন্যতম প্রধান কাজ। সমাজের সাধারণ মানুষ শিক্ষক ও উলামাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতো। তারা তাঁদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতো, এমনকি কখনো কখনো তা যদি রাষ্ট্রের সুলতানের বিরুদ্ধেও যেতো। সমাজের সাধারণ মানুষ উলামার নির্দেশনাকে অধিক বিশ্বস্ততা ও আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করতো। সুলতানি শাসকবৃন্দ উলামাদের অত্যন্ত মর্যাদা

দিতেন। রাষ্ট্রীয় ও শাসনকার্যে তাঁদের পরামর্শ নিতেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁদের অনেকে উলামাদের জীবনযাত্রা ও অভ্যাসের প্রতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে ভক্ত বা মুরিদ হতেন।

বাংলায় আগমনকারী অন্যতম প্রভাবশালী দরবেশ ছিলেন শাইখ জালাল আল-দীন তাবরিযি।[৩] সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠীর উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁর খানকাহ পাণ্ডুয়ার নিকটে দেওতলায় অবস্থিত ছিল। সুলতান আলী শাহ তাঁর সমাধির উপরে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে সরকারি নির্দেশানুযায়ী দেওতলার নাম পরিবর্তন করে তাব্রিজাবাদ রাখা হয়।[৪] সমগ্র মুসলিম শাসনামলে তাব্রিজাবাদে বহু মসজিদ ও অন্যান্য সৌধ নির্মাণ করা হয়। এ থেকে ধারণা করা যায়, জনসাধারণের উপর জালাল আল-দীন তাবরিযির প্রভাব ও ভালবাসা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়ে বুখারা হতে আগমন করেন শাইখ শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামা। তিনি সেখানে খানকাহ ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সুফি-সাধক ও প্রখ্যাত আলিম নিযাম আল-দীন আউলিয়ার অন্যতম শিষ্য পির আখী সিরাজ আল-দীন লাখণাবতী রাজ্যে আগমন করেন। তিনি তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের উপর সুলতান হুসাইন শাহ ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে একটি স্থাপত্য নির্মাণ করেন। তাঁর পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের নাম যথাক্রমে আলাউল হক, নূর কুতুব-উল আলম এবং শাইখ আনোয়ার। শাইখ আনোয়ারের পুত্র ছিলেন শাইখ জাহিদ। এই বংশীয় সুফি-সাধক ও উলামা শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, সমসাময়িক রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ তাঁর সৌজন্যে কলকাতার নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে পাণ্ডুয়ায় আলাউল হকের জন্য তিনি একটি খানকাহ নির্মাণ করেন। সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহ পির আতা শাহের অনুসারী ছিলেন। তিনি এই বিখ্যাত আলিমের কবরের উপরে একটি স্থাপত্য নির্মাণ করেন।

ধর্মীয় বিষয় ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সুলতান সিকান্দার শাহের সঙ্গে তৎকালীন উলামা সম্প্রদায়ের বিরোধ হয়। আলিমগণ মনে করতেন, শাসন বিষয়ে বিশেষ করে রাষ্ট্রের ধর্মনীতি নির্ধারণে ও প্রশাসনের ধর্মীয় দিক নির্দেশনায় উলামা শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত। কিন্তু সুলতান সিকান্দার শাহ প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় বিষয়েও সর্বোচ্চ ক্ষমতার দাবি করতেন। তিনি মুদ্রায় নিজেকে 'আল আযম জিল্লুল্লাহ' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া এবং 'আল ইমাম' অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে সর্বোচ্চ পদাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে, অন্যান্য আলিমদের মত আলাউল হকও ধর্মীয় ব্যাপারে প্রভূত্বের দাবি করতেন। সুতরাং 'আল ইমাম' হিসেবে সুলতানের সাথে উলামা সম্প্রদায়ের তৎকালীন সময়ের প্রভাবশালী আলিম আলাউল হকের বিরোধ হয়। ফলে সুলতান সিকান্দার শাহ তাঁকে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসনে প্রেরণ

করেন। আলাউল হক সোনারগাঁওয়ে গিয়ে সিকান্দার শাহের পুত্র ও সোনারগাঁওয়ের প্রাদেশিক শাসনকর্তা গিয়াস আল-দীন আযম শাহকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পুত্রের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে আকস্মিক আক্রমণে সিকান্দার শাহ নিহত হন। গিয়াস আল-দীন আযম শাহ পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলাউল হকের পুত্র নূর কুতুব-উল আলমকে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করেন।

সুলতান গিয়াস আল-দীন আযম শাহের রাজত্বকালে নূর কুতুব-উল আলমের নেতৃত্বে রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উলামা সম্প্রদায়ের প্রভাব অনেক বেড়ে যায়। এ সময়ে শাসকগোষ্ঠী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন চমৎকার ছিল। নূর কুতুব-উল আলম ছিলেন সমসাময়িক বাংলার প্রভাবশালী আলিম। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থাদি এবং শিলালিপিতে তাঁকে খলিফা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময়ে উলামা সম্প্রদায়ের আহ্বানে দেশের সাধারণ জনসমাজ ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠে। রাজা গণেশ মুসলমানদের প্রভাবকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে নিজেই একসময় রাজসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সহযোগিতায় রাজা গণেশ রাজসভায় ফিরে এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তিনি চুক্তি মোতাবেক নিজ পুত্র যদুনাথের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও নিজে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র করবেন না মর্মে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ সমস্ত বিবরণ থেকে বাংলায় উলামার পরিচয় ও প্রভাব প্রতিপত্তির ধারণা পাওয়া যায়।

একটি প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে উলামা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটেছিল উপমহাদেশের বিখ্যাত সুফি সাধক ও বিশিষ্ট আলিম নিযাম আল-দীন আওলিয়ার সময় থেকে।[৫] বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় বাংলার আলিমগণও একটি বিশেষ গোষ্ঠী। আলিমগণ মুসলিম সমাজে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতিতেও ছিল আলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ইসলামের ধারণায় একজন শাসক ততক্ষণই মুসলমানদের উপর শাসন করতে পারেন যতক্ষণ তিনি নিজে ইসলামি জীবন বিধান অনুসরণ করে থাকেন এবং ইসলামি বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেন। অর্থাৎ ইসলামি বিধান মতে, একটি রাষ্ট্রের প্রধানকে অবশ্যই আলিমও হতে হবে। ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা প্রদান এবং ইসলামি বিধান মতে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখা ছিল আলিমদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ। বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আলিম-উলামা, সুফি দরবেশগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের উপমহাদেশ ও বাংলা বিজয় এতদঞ্চলে ইসলামের প্রসার ত্বরান্বিত করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে বাংলা বিজিত হওয়ার ফলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এদেশে

উলামা-মাশাইখের আগমন বৃদ্ধি পায়।[৬] এ ক্ষেত্রে শাহ মুখদুম আব্দুল কুদ্দুস রুপোশ (রহ.), শাহ্ তুরকান (রহ.), মাওলানা শাহ্ দাওলা (রহ.), শাহ মুকাররম (রহ.), শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ (রহ.), শাহ সুলতান (রহ.), মাওলানা তাকীউদ্দিন আল আরাবি (রহ.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মাওলানা তাকী আল-দীন আল-আরাবি (রহ.) খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মহিসুন বা মহিসন্তোষে এসে ইসলাম প্রচার করেন। বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানায় মহিসন্তোষ অবস্থিত। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসা পরবর্তীকালে বাংলার মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মাদরাসাটির খ্যাতি চারিদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে শিক্ষালাভ করতেন। এসব শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রচারের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং জনগণ ইসলামের সঠিক বিধানের সাথে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল।[৭]

হযরত তুরকান শাহ (রহ.) হযরত শাহ মখদুম (রহ.) এর আগেই ইসলাম প্রচারের জন্য রাজশাহীর মহাকাল গড়ে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হিন্দু রাজার নির্দেশে নিহত হন। হযরত শাহ মখদুম (রহ.) এর মাজারের নিকট রাজশাহী সরকারী কলেজের প্রাচীর বেষ্টনীর কাছেই তার মাজার অবস্থিত।[৮] হযরত শাহ মুখদুমের (রহ.) মাকবারা বা সমাধি সৌধ রাজশাহী শহরের দরগাপাড়া মহল্লায় অবিস্থত। কথিত আছে যে, বর্তমান রাজশাহী শহর পূর্বে মহাকালগড় হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তা দেও বা দেব উপাধি বিশিষ্ট কোন তান্ত্রিক রাজার রাজধানী শহর ছিল। রামপুর তখন রাজশাহীর অপর নাম হিসেবে বিবেচিত হতো। এই দেব রাজ্যের তান্ত্রিক রাজা অংশু দে ও চন্দভণ্ডী বর্মাভোজ ও তার ভ্রাতা অংশু দে ও খেজ্জুর চান্দ খগড় বর্মগুজ্জভোজ দেবতার সন্তুষ্টির জন্য নরবলি দিত। এই তান্ত্রিক শাসক সম্ভবত রাজশাহী অঞ্চলের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। প্রজাগণ তার অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। ইসলাম প্রচার ও জালিম শাসকের হাত থেকে মুসলমান ও এলাকার জনগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শাহ তুরকান (রহ.) এখানে আসেন। শাহ তুরকান (রহ.) ও দেব রাজার মধ্যে যুদ্ধে শাহ তুরকান (রহ.) শাহাদাত বরণ করেন। তান্ত্রিক রাজার এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধান করার উদ্দেশ্যে শাহ মখদুম (রহ.) তাঁর শিষ্য ও অনুচরবর্গসহ বাগদাদ থেকে রাজশাহী আসেন। এরপর তিনি তান্ত্রিক রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তিনি তাঁর প্রচার কার্যে সাফল্য অর্জন করেন এবং মুসলিম সমাজ গঠনের জন্য তাওহীদের অমিয় বাণী জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। ফলে নরবলি প্রথার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সাম্য, প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের শিক্ষা জনমনে স্থিতি লাভ করে।[৯]

হযরত শাহনূর (রহ.) ছিলেন হযরত শাহ মখদুম (রহ.) এর নিকট আত্মীয়। তিনি একজন মহাপণ্ডিত ও কামেল দরবেশ ছিলেন। তিনি ছিলেন গওছল আযম হযরত বড়

পির (রহ.) সাহেবের পবিত্র মাযারের খাদেম এবং হযরত শাহ মখদুম (রহ.) সাহেবের বংশের একজন সুলতান। কথিত আছে একদা তিনি গওছল আযম (রহ.) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়াতে সমাহিত তাঁর পূর্বপুরুষ শাহ মখদুমের (রহ.) মাযারে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থান ও ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।[১০]

ষোড়শ শতাব্দীতে মাওলানা শাহ দাওলা (রহ.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজশাহী জেলার বাঘায় উপনীত হন। বাংলার সুলতান নাসির আল-দীন নুসরত শাহের (১৫১৯ -১৫৩১ খ্রি.) আমলে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে বাঘায় আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি জঙ্গলাকীর্ণ বাঘায় জনপদ গড়ে তোলেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে শিরক ও অনাচারের মূলোৎপাটন করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। হযরত মাওলানা শাহ দাওলার (রহ.) পুত্র হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদ দানিশমন্দ (রহ.) পিতার ন্যায় হক্কানি আলিম ও কামিল সুফি ছিলেন। ইসলামি শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি সর্বোৎকৃষ্টভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মাওলানা আবদুল হামিদ দানিশমন্দের পুত্র হযরত আবদুল ওয়াহাব একজন কামিল সাধক ছিলেন। তার পুত্র মাওলানা রফিকের বংশধরগণ রইস-ই-বাঘা হিসেবে মর্যাদা পেয়ে এসেছেন।[১১]

রাজশাহী শহর হতে পশ্চিম দিকে প্রায় বার মাইল দূরত্বে রাজশাহী চাঁপাই নবাবগঞ্জ রাস্তার পাশে কুমারপুরে হযরত শাহ মুকাররমের (রহ.) মাকবারা অবস্থিত।[১২] তিনি একজন কামিল ওলী ছিলেন। তিনি রাজশাহীর কুমারপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও দীনের প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে বিশেষ করে রাজশাহীতে বৈষ্ণব মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈসলামিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এই বৈষ্ণব মতবাদ যাতে মুসলমানদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে না পারে সে জন্য হযরত শাহ মুকাররাম (রহ.) শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য খেতুরের নরোত্তম ঠাকুরের সাথে পরোক্ষভাবে ধর্মীয় আদর্শের তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁর নিকট অনেক আলিম ও সুফি জমায়েত হন এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিরক, কুফর ও বৈষ্ণব মতবাদ প্রতিহত হয়।[১৩]

এই পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিত্তবান ব্যক্তি, মুসলিম শাসক ও সুলতানগণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের রাজধানী শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ্ গড়ে উঠতে থাকে। উলামা-মাশাইখ ও শিক্ষকগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মদদ-ই-মাশ হিসেবে ইকতা ও লাখারাজ ভূমি লাভ করতেন।[১৪] এছাড়াও বাংলায় ইসলামি শিক্ষা বিতরণের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাল থেকে ওয়াইয ও হক্কানি আলিমগণ যে প্রচেষ্টা চলিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত মাদরাসা ও প্রসিদ্ধ বক্তাগণের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে উলামা ও মাশাইখ মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ্ ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ের উলামা ও

মাশাইখ সমাজ উন্নয়নে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁরা জনগণের পানির কষ্ট দূর করার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে দিঘি খনন করেন। সুফি সাধকদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ নিরণ্ন মানুষ ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হ'ত।[১৫]

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনার কারণে মুসলমানগণ বরাবরই জ্ঞান অর্জনকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এসেছে। কোরআন-হাদিসের জ্ঞানের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের বিচরণ লক্ষ করার মত। জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ এমনকি রাষ্ট্রের প্রধান কর্তাব্যক্তিও ইসলামের জ্ঞান অর্জনের নির্দেশনার প্রতি অবিচলিত থেকে শিক্ষা বিস্তারে যার যার সুবিধামত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলায় মুসলিম শাসনামলের গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সমস্ত মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁর মধ্যে মহিসুনে মাওলানা তাকী আল-দীন আরাবীর মাদরাসাটি প্রাচীনতম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি মহিসুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬] মাদরাসাটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট থানার চৌঘাট মৌজায় মহিসুন মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানটি বর্তমানে মাইগঞ্জ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে মাদরাসাটি মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে একটি উন্নততর মাদরাসায় পরিণত হয়। সুলতানের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে মসজিদ, খানকাহ, লঙ্গরখানা, পুকুর এবং চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠার তথ্য জানা যায়। মাওলানা তাকী আল-দীন আল আরাবীর সুনাম, পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও শিক্ষার্থীগণ মাদরাসায় শিক্ষার্জনের জন্য আসতে থাকে। মাওলানা তাকী আল-দীন আল আরাবী ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠা করলেও তৎকালীন সুলতানদের সহযোগিতায় মাদরাসাটি বেশ সুনাম অর্জন করে। এখানে মাওলানা তাকী আল-দীন আজীবন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৭]

মাওলানা শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামা নির্মিত সোনারগাঁয়ের মাদরাসাটিও প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল। মাওলানা শরফ আল-দীন একজন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন খোরাসানে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও জনপ্রিয়তায় তৎকালীন দিল্লীর সুলতান গিয়াস আল-দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ) শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। ফলে শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামা তাঁর পরিবারসহ ভাই মাওলানা জইন আল-দীনের সাথে বাংলায় আসতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে মানেরীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই তিনি খানকাহ ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮] সোনার গাঁয়ে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামার। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই মাদরাসা পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তীতে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সুফি ও পণ্ডিত ব্যক্তি শাইখ আলাউল হক তাঁর নির্বাসনের সময়ে দু'বছর এখানে অবস্থান করে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পৌত্র শাইখ বদর-ই ইসলাম এবং প্রপৌত্র শাইখ জাহিদী তাঁদের নির্বাসনকাল

এখানে অতিবাহিত করেন। এ সমস্ত সাধু পুরুষ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সোনারগাঁও ইসলামি জ্ঞান চর্চার একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে সুলতান নসরত শাহের আমলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পেয়ে আরো সমৃদ্ধি অর্জন করে। সুলতান রুকন আল-দীন কাইকাউসের (১২৯১-১৩০১ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাফর খান কর্তৃক কাযি আল নাসির মুহম্মদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় হুগলী জেলার সাতগাঁয়ের ত্রিবেণীতে (ফিরুজাবাদ নামে পরিচিত) একটি মাদরাসা নির্মাণের তথ্য জানা যায়। সুলতান রুকন আল-দীন কাইকাউসের শাসনামলের শিলালিপিসূত্রে একটি মাদরাসার থাকার তথ্য অবগত হওয়া যায়।[১৯] জাফর খান ছিলেন এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। কাযি নাসির মুহাম্মদ মাদরাসা নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করেন।[২০] মাদরাসার জন্য খরচ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের থাকা, খাওয়াসহ যাবতীয় ভরণ-পোষণের খরচ কাযি নাসির মুহাম্মদ ব্যয় করতেন এ মাদরাসাটিও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো বলেই অনুমান করা যায়।

শিলালিপির তথ্যেও একথা স্পষ্ট যে, ত্রিবেণী মাদরাসাটি পরিচালিত হতো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সহযোগিতায়। শিলালিপিসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, জাফর খান দারুল খায়রাত নামে অপর একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন।[২১] এটি ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে। জাফর খান সমকালে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরপর দুইজন সুলতান যথাক্রমে রুকন আল-দীন কাইকাউস এবং শামস আল-দীন ফিরুজ শাহের অধীনে চাকুরি করেছেন। এমনকি ত্রিবেণী অঞ্চল বিজয়ে তিনি বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছেন বলেও ধারণা পাওয়া যায়। ত্রিবেণী মাদরাসা সম্পর্কিত দ্বিতীয় শিলালিপিতে তাঁকে খান-ই-জাহান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধারণা করা যায় যে, শিলালিপি জাফর খানের নির্দেশেই উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

শিলালিপিতে একটি মাদরাসার নাম 'দারুল খায়রাত' উল্লেখ করা হয়েছে। খায়রাত অর্থ সাধারণ মানুষের সাহায্য। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সাধারণ মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতায় মাদরাসাটি নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার অন্যতম স্থাপত্য বিদ্যাপীঠ দরসবারি মাদরাসা। স্থাপত্য পরিকল্পনার ব্যাপকতাই বলে দেয় রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্মিত হয়েছিল এটি। আলা আল-দীন হুসাইন শাহ শাসনামলে নির্মিত হওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায় শিলালিপি থেকেই। সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহ স্থাপত্য স্থাপনায় খ্যাতিমান সুলতান। তিনি যে মাদরাসা স্থাপনায় সহযোগিতা করেছিলেন তা অনায়াসেই বিশ্বাসযোগ্য। তবে ছাত্র-শিক্ষকদের ভরণ-পোষণ, মাদরাসার আরো আনুষঙ্গিক খরচাদি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য অবগত হওয়া যায় না। তবে ধারণা করা যায় যে, এই বিখ্যাত মাদরাসাটি সরকারি এবং সাধারণ জনগণের দান-দাক্ষিণ্যে পরিচালিত হতো। বিশাল এই মাদরাসা সংলগ্ন আরো ইমারতাদি ছিল বলেও ধারণা করা যেতে পারে।

দরসবারির বিশালত্ব ও স্থাপত্য পরিকল্পনার নিদর্শন দেখে মনে হয় এটি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দু'টি শিলালিপির ভাষা থেকে অনুধাবন করা

যায়, সুলতান আলা আল-দীন শাহ সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এই মাদরাসাগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মাণ করেছিলেন।

শাইখ নুর কুতুব উল-আলম নির্মিত পাণ্ডুয়া মাদরাসা। এটি সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১১ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত। মাদরাসাটি বেশ বিখ্যাত ছিল। বাংলা শুধু নয়, বাংলা ছাড়াও উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাদরাসায় শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা আসতো। শুধু তাই নয় অন্যান্য অঞ্চলের প্রথিতযশা শিক্ষক ও জ্ঞানীগুণীরাও জ্ঞানচর্চার জন্য এই মাদরাসায় নিয়মিত আসতেন। ধারণা করা যায়, এই মাদরাসায় অনেক দুর্লভ বই-পুস্তকও ছিল। দূর হতে আগত জ্ঞানীগুণীদের থাকার জন্য ব্যবস্থাও ছিল। ফলে মাদরাসা পরিচালনায় এক বিরাট খরচের প্রয়োজন হতো। জানা যায় সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহ মাদরাসা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখেরাজ ভূমি দান করেছিলেন।[২২] পরবর্তীতেও মাদরাসাটি পরবর্তী সুলতানদের নিকট থেকে সহযোগিতা পেয়ে এসছে বলে ধারণা করা যায়। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, মাদরাসাটি সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সুফি-সাধক ও আলিম-উলামদের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

বাংলার সুলতানি আমলে সুলতানগঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট ছিল। স্থানটি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন রাজশাহী শহর থেকে ৩২ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেতে বাম দিকে স্থানটি অবস্থিত। এ স্থানকে জাহানাবাদ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুলতান জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহের আমলের ৮৩৫ হিজরি সালের (১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ) সুলতানগঞ্জ মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপিটি আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ। শিলালিপিটিতে ভাষা, ব্যাকরণ ও তথ্যগত কিছু ত্রুটি[২৩] পরিলক্ষিত হলেও এর অন্তর্নিহিত ভাব থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, এই মসজিদের সাথে একটি মাদরাসা সংযুক্ত ছিল।[২৪]

শিলালিপির দ্বিতীয় সারির শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, "মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য এক দিরহাম খরচ করে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় লাল স্বর্ণের একটি পাহাড় ব্যয় করে।" উৎকীর্ণ এই অংশের ভাবার্থ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করা হয়েছে। শিলালিপির তৃতীয় সারিতে উল্লেখ করা হয়েছে— "এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু এবং শেষ হয়েছিল আমীর জালালুদ্দীন আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ শাহ সুলতানের আমলে। তাঁর সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হোক। এই মহৎ কাজের নির্মাণকারী ছিলেন সুলতানের বিশেষ প্রিয়ভাজন, দশজন পানি সরবরাহকারীর নেতা মালিক সদরুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন। তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হোক। তিনি এই ইমারতের নির্মাণ কাজ ৮৩৫ হিজরির/১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ জমাদিউল আওয়াল মাসের ৫ তারিখ রবিবারে শুরু করেছিলেন।" শিলালিপি থেকে ধারণা করা যায় যে, সুলতান জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহ মসজিদের সাথে সাথে একটি মাদরাসাও নির্মাণ

করেছিলেন। ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী উল্লেখ করেছেন মাদরাসাটি সুলতান জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহের একজন প্রিয়ভাজন অমাত্য কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[২৫] আলোচ্য শিলালিপিতে জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য এক দিরহাম ব্যয় করাকে এক স্বর্ণের পাহাড় দান করার সাথে তুলনা করে জ্ঞান অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, মাদরাসা নির্মাণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়াও জনগণের ব্যক্তিগত সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন রাখা হয়েছে যেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষার্থীদের জন্য মাদরাসা গড়ে উঠতে পারে। সাথে সাথে ধারণা করা যাচ্ছে যে, মাদরাসাটি সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় হলেও সাধারণ্যের অংশগ্রহণ থাকলেও থাকতে পারে।

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত থানা শহর বাঘা। বাঘায় সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরাত শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) আমলের একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদের দেওয়ালে একটি শিলালিপি সংযুক্ত রয়েছে। শিলালিপি থেকে অবগত হওয়া যায় যে, মাওলানা আবদুল হামিদ দানিশমান্দ সংক্ষেপে হাওদা মিয়া এখানে একটি মাদরাসা পরিচালনা করতেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যটক আব্দুল লতিফ বাঘা পরিভ্রমণের সময় আব্দুল হামিদ দানিশমান্দের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তখন প্রায় শত বৎসরের একজন বৃদ্ধ ছিলেন।[২৬] আবদুল লতিফ তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর ধারণা করেন তাঁর প্রায় ১৫-১৬ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতা শাহ মুয়াযযম দানিশমান্দ সংক্ষেপে শাহ দাওলা সুফিদের জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্মিক আলোচনার জন্য একটি খানকাহ ও তৎসংলগ্ন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২৭] ফলে স্থানটি জনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুলতান নাসির আল-দীন নুসরাত শাহের শাসনামলে (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ) স্থানটি কসবা-এর মর্যাদা পায়। সুলতান নাসির আল-দীন নুসরাত শাহ এখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মাদরাসায় সাহায্য হিসেবে লাখারাজ ভূমি দান করেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাসংক্রান্ত জরিপে এই মাদরাসাটির উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঘা মাদরাসা প্রথমত ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে সরকারি সাহায্য সহযোগিতায় বিকাশ লাভ করেছিল।

শাইখ আতা ব্যক্তিগত উদ্যোগে দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও পরবর্তীতে বাংলার সুলতানগণ মাদরাসাটিকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ মাদরাসার পার্শ্বে একটি গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতান জালাল আল-দীন ফতেহ শাহ ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে মাদরাসাসংলগ্ন একটি পাথরের ইমারত নির্মাণ করেন। সুলতান শামস আল-দীন ফিরুয শাহ ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে আলা আল-দীন হুসাইন শাহ এখানে একটি মিনারবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করে মাদরাসাটিকে পূর্ণাঙ্গ মাদরাসার রূপ প্রদান করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর মাদরাসাও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন

সুলতানদের সহযোগিতায় মাদরাসাটি বিকশিত হয়। ফলে মাদরাসাটি সমকালে জ্ঞান অর্জনের একটি উচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন। অর্থের পর্যাপ্ততা না থাকলে কোন প্রতিষ্ঠানই ঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। তাই মুসলমানগণ সর্বাবস্থায় শিক্ষার্জনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আরবের মুসলমানগণের মত দেখা গেছে সুলতানি পর্বেও বাংলার মুসলমানগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল। এ সময়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য তেমন কোন খরচ হতো না। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীর ভরণ-পোষণ, বই-পুস্তক ক্রয়, আবাসিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য মোটা অংকের খরচ হতো। এ কথা উল্লেখ্য যে, উচ্চতর শিক্ষার মাদরাসাসমূহ বাংলার মুসলিম শাসকদের আর্থিক অনুদান এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। বিভিন্ন শিলালিপির তথ্যসূত্রে ও সমকালীন রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, বাংলার মুসলিম শাসকগণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করে উচ্চতর শিক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছেন।[২৮] জাফর খানের ত্রিবেণী মাদরাসা, জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহের সুলতানগঞ্জ মাদরাসা, আলাআল-দীন হুসাইন শাহের দরসবারি মাদরাসা, মাওলানা তাকী আল-দীন আল আরাবির মহিসুন মাদরাসা, হাওদা মিয়ার বাঘা মাদরাসা, প্রত্যেকটিতে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করা হয়েছিল। কিন্তু মাওলানা শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামার সোনারগাঁও মাদরাসা সম্পর্কে এরূপ কোন দানের কথা জানা যায় না। কিন্তু বাংলার সুলতানগণ আলিম-উলামা এবং সৈয়দ-সুফিদের যেভাবে ইনাম, মিল্ক এবং মদদ-ই-মা'শ দিতেন- তাতে ধারণা করা যায় যে, তিনি হয় তো মাদরাসা পরিচালনা করার জন্য ভূ-সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। বাংলার সুলতানগণ মসজিদ, মাদরাসা খানকাহ প্রতিষ্ঠাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। এ কারণেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৯] মাদরাসার শিলালিপির অনেক গুলোতেই 'দার-উল খয়রাত' বা 'বিনা-উল খয়রাত' বলা হয়েছে। এতে ধারণা করা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি মঞ্জুরির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দানশীল লোকেরাও মাদরাসার জন্য এবং বিশেষ করে ছাত্র-শিক্ষকের জন্য ভূমি দান বা অর্থ দান করতেন। জাফর খানের ত্রিবেণী মাদরাসার শিলালিপিতে এই কথা লিখা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, কাযি নাসির মুহাম্মদ তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দান করেন। বাঘাস্থ হাওদা মিয়া 'মদদ-ই মাশ' হিসেবে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। কথিত আছে যে, তাঁর বংশধররা ২২টি গ্রাম ওয়াক্ফ হিসেবে লাভ করেন। আবার কারো মতে তাঁরা ৪২টি গ্রাম মদদ-ই মাশ হিসেবে লাভ করেন।[৩০] ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এডাম তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে বলেন, "কসবা বাঘায় অবস্থিত মাদরাসাটি বহুদিনের বৃত্তিভোগী প্রতিষ্ঠান। প্রতীয়মান হয়, সম্পত্তিটার প্রথমত দুটি অংশ ছিল, যা পৃথক পৃথক সরকারি মঞ্জুরির দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের ঊনিশতম বছরে একটি সনদে

মাদরাসাকে মদদ-ই মাশ রূপে পূর্ব পদ ও ভূমি দানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং যাকে শাহজাহানের সনদটি দেওয়া হয়েছিল সেই শাইখ আব্দুল ওহাবকে মাওলানা উপাধি প্রদান করা হয়।"[৩১] একই ভাবে মহিসুন (চতুর্দশ শতাব্দীতে বারবকাবাদ নামে পরিচিত) মাদরাসাটিতেও প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করা হয়েছিল। কোনো কোনো সূত্রে জানা যায় যে, মহিসুন (স্থানীয়ভাবে মাইগঞ্জ নামে পরিচিত) মসজিদ, মাদরাসা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৭৫০ বিঘা লাখারাজ ভূমি অনুদান হিসেবে মুসলিম শাসন আমল থেকে চলে আসছিল। এমনকি তা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল।[৩২] ব্রিটিশ শাসনামলে তা ক্রমান্বয়ে রদ হয়ে যায়। মহিসুন দরগার বর্তমান খাদিম মোঃ রমজান আলী দেওয়ান (স্থানীয়ভাবে চেরাগী নামে পরিচিত) ঐ বিশাল ভূসম্পত্তির কিছু অংশ এখনো ভোগ দখল করে আছেন।[৩৩] ব্রিটিশ সরকারের লাখারাজ বাজেয়াপ্তির বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের নামে অসংখ্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।[৩৪] এ সমস্ত উদাহরণ থেকে নিশ্চিত করে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলার সুলতানি শাসনপর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ণ সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। সরকারি অনুদানে সমৃদ্ধ হয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহাকে আরো বেশি বেগবান ও সহজ করেছে।

সুলতানি পর্বে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের তথ্য অবগত হওয়া যায় তার সবগুলোই ছিল আবাসিক। মাদরাসায় ছাত্র এবং শিক্ষকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সোনারগাঁওয়ের মাওলানা শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামার মাদরাসা যে আবাসিক ছিল তার প্রমাণ শরফ আল-দীন ইয়াহিয়া মানেরীর জীবনের একটি ঘটনা থেকে জানা যায়। কথিত আছে যে, মাদরাসার সকল ছাত্র-শিক্ষক একই দস্তরখানে বসে খাওয়া দাওয়া করতেন। এতে অনেক সময় ব্যয় হতো। শরফ আল-দীন ইয়াহিয়া মানেরী জ্ঞান চর্চায় এতটাই অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি এতটুকু সময়ও অপচয় পছন্দ করতে চাইতেন না। বরং তিনি দস্তরখানে খাওয়া ছেড়ে দিতেন। এতে অনেক সময় তাঁকে অভুক্ত থাকতে হতো। তাঁর শিক্ষক শরফ আল-দীন আবু তাওয়ামা এ কথা জানতেই তাঁর খাবার ভিন্নভাবে দেবার ব্যবস্থা করে দেন।[৩৫] এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, মাদরাসাটি নিঃসন্দেহে আবাসিক ছিল।

ত্রিবেণী মাদরাসাটি আবাসিক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, উক্ত মাদরাসার শিলালিপি থেকেই। এতে কাযি মুহাম্মদ আহল-উল-ফজল এর সকল জীবিকার ব্যবস্থার জন্য তাঁর বিরাট অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। আহল-উল-ফজল বলতে মাদরাসার শিক্ষক, ছাত্র এবং কর্মচারী সকলকেই বুঝানো হয়েছে। শিলালিপিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (কাযি নাসির মুহাম্মদ) কর্মচারীদের গালিচাও প্রদান করেছেন।[৩৬] এর অর্থ এই যে, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলেই বিনা খরচে আবাসিক সুবিধা পেতেন। সুলতান জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহের (গণেশের পুত্র) শিলালিপিতেও তালিব-উল-ইলম বা বিদ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে সহজেই ধারণা করা

যায় যে, মাদরাসাটি আবাসিক প্রতিষ্ঠানরূপে নির্মাণ করা হয়েছিল। সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহের দরসবারি মাদরাসার গঠনপ্রণালীও মাদরাসাটি আবাসিক হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। দরসবারি মাদরাসার স্থাপনাটি বর্গাকৃতির। এর প্রত্যেক বাহু বা প্রত্যেক পার্শ্বে ১৬৯ ফুট লম্বা। চতুর্দিকে কক্ষ রয়েছে এবং মাঝখানে একটি আঙিনা রয়েছে। আঙিনার দৈর্ঘ্য ১২৩ ফুট ও প্রস্থ ১২৩ ফুট। চতুর্দিকের কক্ষগুলোর মোট সংখ্যা ৪০ এবং প্রত্যেক কক্ষ ১১-৪´ লম্বা এবং ১১-৪´ চওড়া। এখানে একটি মসজিদও রয়েছে। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট এবং প্রস্থ ১৬ ফুট। মাদরাসার বাইরে পুকুর ছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গোসল ও ওজু করার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। পুকুরের চতুস্পার্শ্বে কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পুকুরে নামার জন্য ঘাটের ব্যবস্থা ছিল। মাদরাসার চৌহদ্দি যে অনেক দূরে বিস্তৃত ছিল তা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বর্ণনাতেই জানা যায়। বিবরণের লেখক আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন,

> The Inmates of the Madrasah, the teachers, students and other emplyees, probably used both the smaller pond on the east and the larger water tank on the west....The northern bank of the larger tank (dighi) and also parts of its western and eastern banks beyond the masonry ghat and the connected pathway, and probably also the area west of the Madrasah bordering the eastern bank appear to conceal substatial cultural accumulation which also reqire to be carefully examined by systemic excavations. These areas were possibly occupied by some sections of the Madrasah establishment. The southern bank also contained cultural debris but its destruction is complete now.[৩৭]

হাওদা মিয়ার (প্রকৃত নাম শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ) বাঘা মাদরাসাও ছিল একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরিব্রাজক আবদুল লতিফ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে যখন এই মাদরাসাটি পরিদর্শন করেন, তখন এটি ছিল একটি খড়ের ঘর। এর আয়তন ছিল বিশাল।[৩৮] এর বিশালাকৃতি দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, এই মাদরাসাটিও ছিল আবাসিক।

এডওয়ার্ড এডাম বাংলার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরির সময় বাঘায় যান এবং মাদরাসা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট লেখেন। তাঁর রিপোর্টে জানা যায়, শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে থাকা, খাওয়া, পোশাক, ধোপা খরচ, তৈল এবং কাগজ-কলম সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেতো।[৩৯] এ ছাড়া বাঘা মাদরাসার প্রথম এবং প্রধান মুদাররিস মাওলানা শের আলী এবং দুজন ইরানি শিক্ষকের মাযার বাঘা মাদরাসা চত্বরে রয়েছে। এ সব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, বাঘা মাদরাসা একটি পূর্ণ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত দরদ সহকারে পাঠদান করতেন। শিক্ষার্থীগণও শিক্ষকের পাঠ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করতো। বাংলায় ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতই শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মান ছিল অতিউচ্চাসনে। এটি ছিল

একটি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য। শিক্ষাগুরু যেমন সমাজ এবং অভিভাবক কর্তৃক সম্মানিত হতেন-তেমনি শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষককে পিতামাতার পরই স্থান দিত। শিক্ষকগণ শুধু শিক্ষালয়ে শিক্ষাদান দিয়েই তাঁদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ করেননি, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁরা জড়িত ছিলেন। বাহরাম খাঁর 'লায়লী মজনু' কাব্যে ছাত্র এবং সমাজের কাছে শিক্ষককে সম্মানজনক অবস্থানে তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতো এবং বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে ভয়ও পেত। সুলতানি শাসনপর্বে শিক্ষিত শ্রেণীর মর্যাদা ছিল। সমাজের মানুষ তাদের প্রতি এক ধরনের সম্ভ্রমবোধ প্রদর্শন করতো। শিক্ষকশ্রেণির মর্যাদাও ছিল সমাজে। উল্লেখ পাওয়া যায়, মাদরাসাগুলোতে শিক্ষকদের প্রচুর বেতন দেয়া হতো। শিক্ষকগণের সম্মানার্থে সমাজের সাধারণ ও বিত্তবান মানুষ তাদের জমির উৎপাদিত ফসল, বাসা-বাড়ির গাছের নতুন ফল কিংবা ভালবাসার কোনো বস্তু প্রথমত তাদেরকে দিয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতো। যে কোনো ধরনের পরামর্শ গ্রহণে তারা প্রথমত শিক্ষকগণের কাছেই ছুটে আসতো। শিক্ষকদের সন্তুষ্টি অর্জনে তারা সর্বতো চেষ্টা করতো। এ থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, সমাজে শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষ করে শিক্ষকগণের মর্যাদা ছিল উচ্চপর্যায়ের। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের শিক্ষাদানের বিষয়ে শিক্ষকগণের প্রচুর স্বাধীনতা ছিল।

বখতিয়ার খলজি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, মাকতাব, মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের নবমুসলিমদের ইসলামি নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞানদানের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বখতিয়ার খলজি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিজিত বাংলাকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একটি সুশিক্ষিত জাতির প্রয়োজন। সুতরাং ইসলামের উৎসভূমি আরবের মক্কা-মদিনা কিংবা উমাইয়া আমলের সিরিয়া বা আব্বাসীয়দের বাগদাদের স্টাইলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করে তৎসংলগ্ন মাকতাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দান করেন। সুফিদের জ্ঞানচর্চা ও নির্বিঘ্ন ইবাদত বন্দেগীর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন খানকাহ। বখতিয়ার খলজির ধারাবাহিকতায় পরবর্তী মুসলমান শাসকবৃন্দও ইসলামের জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে সুলতান গিয়াস আল-দীন ইওয়াজ খলজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি লাখণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে অনেক কল্যাণধর্মী অবদান রাখেন। তিনি বহু ইবাদতখানা ও মসজিদ নির্মাণ করে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিকাশে অবদান রাখেন। এ ছাড়াও তিনি উলামা মাশাইখের সম্মানে ভাতা প্রদান করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতানি শাসনপর্বে অসংখ্য মসজিদ, মাকতাব, মাদরাসা ও খানকাহ নির্মিত হয়েছিল। ইসলামের শুরু থেকেই মসজিদ মুসলমানদের শুধুমাত্র ইবাদতগৃহ হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইবাদতের সাথে সাথে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবেও মসজিদের ভূমিকা দেখা যায়। সুলতানি শাসনপর্বেও মহানবী (স.)-এর যুগের মত মসজিদে জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। শিশুদের শিক্ষার জন্য মসজিদে মাকতাব বসতো। কখনো কখনো মসজিদের

পার্শ্বে কোনো ঘর বা ফাঁকা স্থানে মাকতাব পরিচালিত হতো। এক্ষেত্রে কিছু মসজিদ পাওয়া যায় যা বর্তমানে ভগ্ন হলেও সুলতানি শাসনপর্বের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। সুলতানি শাসনপর্বে উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মাদরাসার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময়কালে সুফিদের নিরন্তর জ্ঞানচর্চার স্থান হিসেবে এ সময়ে অনেক খানকাহ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত মাদরাসা ও খানকাহগুলো বেশিরভাগই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে সরকারি ও বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়েছিল।

তথ্যসূচি:

---

১ Shaykh Abd al-Haqq Dehlowi, *Akhbar al Akhyar*, Urdu Tr. Mawlana Subhan Mahmud (Karachi: Madinah Publishing Company. n.d.), P. 191.

২ Ibid, P. 310.

৩ একেএম শাহ নাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০০৯), পৃ. ১৩১

৪ Md. Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. IB Ryadh, P.773.

৫ সুনীতিভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

৬ আবু তালিব, *হযরত শাহ মখদুম রুপোস এর জীবনেতিহাস* (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৯), পৃ. ৫৪

৭ S. A. Akanda (ed.) *The District of Rajshahi: It's Past and Present* (Rajshahi: The Instute of Bangladesh Studies, 1983), P. 67.

৮ ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, পৃ. ৪৪-৪৫; শামসুল হক কোরায়শী, "বরেন্দ্রভূমিতে ইসলাম প্রচার", *রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, রাজশাহী, ১৯৮৯, পৃ. ২১০

৯ আবু তালিব, *হযরত শাহ মখদুম রূপোস এর জীবনেতিহাস*, পৃ. ৫২-৫৪

১০ সা, কা, ম, আনিছুর রহমান খান (সম্পাদিত), *হযরত শাহ মখদুম রূপোস (রহঃ) দরগাহ পাবলিক ওয়াকফ্ এস্টেট, ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (রাজশাহী: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ১৯৯৫), পৃ. ২৯-৩০

১১ ড. তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), কাযি মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস* ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৭) পৃ. ৩৩৯-৩৪৫; ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৯-২৪

১২ S. Ahmed, *Inscriptiption of Bengal*, vol. IV (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960), P. 244.

[১৩] ড. তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), শ্রীকালীনাথ চৌধুরী, *রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রাজশাহী পরিচিতি* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৭), পৃ. ৩৩৭-৩৩৮

[১৪] *The District of Rajshahi: Its Past and Present*, P. 84

[১৫] ড. একে এম শাহনাওয়াজ ও ড. রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ (সম্পা.), *বরেন্দ্র বরেণ্য অধ্যাপক এ কে এম ইয়াকুব আলী সংবর্ধনা গ্রন্থ, (*ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৭), পৃ. ৭০৫-৭০৬

[১৬] M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal* Vol. I (1201-1576), (Karachi: Pakistan Historical Society, 1963), P. 185. (Henceforth the Source may be referred to as *SCHB*)

[১৭] শাহ শুয়াইব, *মানাকিব-আল-আসফিয়া* (সারসংক্ষেপ মকতুবাত-ই-সাদী-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত), পৃ. ৩৩৯

[১৮] M. A. Rahim, *SCHB*, Pp. 181-182.

[১৯] S Ahmed, *Inscription of Bengal,* vol-iv (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960), Pp. 18-21.

[২০] A. H. Dani, *Bibliography of the Muslim Inscription of the Bengal*, (Pakistan: Asiatic Society of Pakistan, 1957), P. 6.

[২১] জাফর খান সুলতান রুকনআল-দীন কাইকাউস এবং সুলতান শামসআল-দীন ফিরুজ শাহ উভয় সুলতানের অধীনে ত্রিবেণীতে উচ্চপদে চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনিই ত্রিবেণী অঞ্চলকে মুসলমান সুলতানদের অধিকারে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় শিলালিপিতে জাফর খানকে খান-ই-জাহান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাফর খানের নির্দেশেই উভয় শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। উৎকীর্ণ উভয় শিলালিপি ছিল আরবি ভাষায়। দ্র. *Ibid*, P. 28-29.

[২২] M. A. Rahim, *SCHB*, Pp. 183-184.

[২৩] শিলালিপির উপরি অংশে হাদিসের কথায় বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে চল্লিশটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন" প্রকৃতপক্ষে এমন কোন হাদিস নেই বরং চল্লিশটি প্রাসাদের স্থলে হাদিসে সত্তরটি প্রাসাদের কথা বলা হয়েছে। দ্র. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮), পৃ. ৯০-৯১

[২৪] *তদেব*, পৃ. ৯১-৯২; এ.কে.এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১৬৭; মোঃ আবদুল করিম, *সুলতানি আমলে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ* (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০২), পৃ. ২৭

[২৫] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, পৃ. ৯১

[২৬] J. N. Sarker, "A Description of North Bengal in 1609 A. D.", *Bengal Past and Present*, 1928, P. 144.

[২৭] A. H. Dani, *op.cit.,*, P. 68; S Ahmed, *Inscription of Bengal,* vol-iv, P. 214.

[২৮] S. Ahmed, *Inscriptiption of Bengal*, vol. IV Pp. 19-20, 28-29, 47-48,

159; *Islamic Studies* Islamabad, vol-xxiv, 4, P.434-435,443; একেএম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, পৃ. ৫৬

২৯ বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, Dr. Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal 2nd edi*., 1985, 4th chapter, Section-A.

৩০ *Ibid*, Pp. 150-151.

৩১ W. Adam, *Second Report on the State of Education in Benga (Rajshahi District*), Calcutta, 1836, Pp. 112-116.

৩২ *Islamic Studies*, Islamabad, vol-xxiv, 4, P.434; একেএম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, পৃ. ৫৬

৩৩ মোঃ আবদুল করিম, *মহিসন্তোষের ইতিহাস*, (রাজশাহী: রাজশাহী বার্তা, ১৯৯৬) পৃ. ৩৯

৩৪ W.W. Hunter, *Indian Musalmans,* London, 1871, P. 177.

৩৫ M. A. Rahim, *SCHB*, Pp. 103-105.

৩৬ S. Ahmed, *Inscriptiption of Bengal*, Vol.IV, P. 19.

৩৭ আবদুল করিম, [*মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ.২৩৩] এবং মো: আবদুল করিম, *সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ* কর্তৃক উদ্ধৃত; প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ রিপোর্ট পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৭৬

৩৮ আবদুল লতিফের বিবরণের জন্য দেখুন, আবদুল করিম, [*মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ.১৯-২৬] কর্তৃক উদ্ধৃত

৩৯ W. Adam, *Second Report on the state of Education in Bengal, (Rajshahi District),* Calcutta, 1836, Pp. 112-116.